পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-স্বত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

লোকসংখ্যার দিক থেকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটি বৃহত্তম দেশ। ভূমিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ লোকের জীবন ও জীবিকা। অর্থাৎ বেশিরভাগ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গ তথা মায় ভারতবর্ষের বেশিরভাগ কৃষকেরই নিজস্ব জমি নেই। নিজস্ব জমি না থাকায় এবং ভূ-স্বামীদের জমি চাষ করায় কৃষকরা নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছিল দীর্ঘকাল ধরে। কৃষকদের বঞ্চনার পিছনে ছিল নানাবিধ কারণ। মূলত কৃষি জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষকের জীবন। কৃষিকার্য ছাড়াও ভারতবর্ষের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষেরই ভূমির ওপর স্বত্ব আরোপের একটা দারুণ স্পৃহা। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে ও জমির চৌহদ্দি নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় জমি জরিপের বিষয়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্তমান দিনে জমি জরিপের কাজ ভালো ভাবে জানার জন্য ভূমি-স্বত্ব নিয়ে ধারনা থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ভূমি-স্বত্ব মানে হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট জমির উপর অধিকার বা মালিকানা যা তাকে সেই জমির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এটি জমির উপর একটি "বান্ডেল অফ রাইটস"-এর ধারণা, যা সম্পত্তির মালিককে বিভিন্ন অধিকার প্রদান করে।

জমির উপর অধিকার:

ভূমি-স্বত্ব একটি জমির উপর অধিকার স্থাপন করে, যার অর্থ হলো মালিক তার জমি ব্যবহার করতে, কাজে লাগাতে, অন্যকে বিক্রি করতে, বা অন্য কোনো উপায়ে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাখে।

সম্পত্তি অধিকার:

ভূমি-স্বত্বকে একটি সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উত্তরাধিকার:

ভূমি-স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রেও অর্জিত হতে পারে, যা অর্থ জমির মালিকানা বংশের পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও চলে যেতে পারে।

ভূমি সংস্কার:

ভূমি-স্বত্ব ভূমি সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা ভূমি মালিকানা এবং ব্যবহারের অধিকারের পরিবর্তন আনতে পারে।

ভূমি রেকর্ড:

ভূমি স্বত্বের জন্য জমির স্পষ্ট এবং আপ-টু-ডেট রেকর্ড রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন প্রকার ভূমি-স্বত্ব:

বিভিন্ন দেশে ভূমি-স্বত্বের বিভিন্ন ব্যবস্থা বিদ্যমান, যেমন - ব্যক্তিমালিকানা, সরকারি মালিকানা, অথবা যৌথ মালিকানা।

ভূ-স্বত্ব নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কারের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে জানা প্রয়োজন।

- **জমিদারি প্রথা:** প্রাচীনকাল থেকে রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং জোতদাররা ছিলেন কৃষি জমির মালিক। তাঁরা কৃষকদের দিয়ে নিজের জমি কর্ষণ করিয়ে উৎপাদিত ফসলের একটা সামান্য অংশ কর্ষণকারীদের দিতেন। ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাট দের আমল থেকেই বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছিল জমিদারি প্রথা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনেও জমিদাররা জমির ওপর তাঁদের কায়েমি শাসন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জমিদারি প্রথার সাথে সাথে আবার সৃষ্টি হয়েছিল কানুনগো, তালুকদার ও চৌধুরীদের জমির ওপর প্রভুত্ব। জমি কর্ষণকারীদের জমিদারি সেরেস্তায় গিয়ে প্রতি বছর ধার্য খাজনা দিয়ে আসতে হত। ভারতবর্ষের কৃষকরা মেনে নিয়েছিল-জমির মালিক জমিদার, তালুকদার, কানুনগো ও চৌধুরীদের। এর পরবর্তী অধ্যায়ে জন্ম নিল জোতদাররা। জমিদারদের কায়েমি স্বার্থের জন্য ব্রিটিশ আমলেও ব্রিটিশ প্রশাসন ভাবেননি 'জমিদারি প্রথা' বিলোপ করার কথা। কাজেই ভূমি-সংস্কার ব্রিটিশ শাসনেও কিছু হয়নি পরাধীন ভারতবর্ষে। বর্তমানে অবশ্য জমিদারি প্রথার অবসান হয়েছে।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের কৃষককে বেঁচে থাকতে হত জমিদার-জোতদারের কৃপার ওপর নির্ভর করে। জমির ওপর কৃষকদের নিজস্ব স্বত্ব না থাকায় কৃষকরা অত্যাচারিত অবহেলিত হতেন। রাজস্ব আদায়ের নির্মম ব্যবস্থায় কৃষকরা নিষ্পেষিত হত।

১৭৮৪ সালে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ এই অবস্থা উপশমের জন্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার কথা ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। এই ভাবনা-চিন্তা থেকেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূচনা' হয়েছিল।

- **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত :** অনেকেরই ধারণা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করা হয়েছিল ভারতবর্ষের কৃষকের স্বার্থে। প্রকৃত ব্যাপারটা তা নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে জমিদারদের স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। এই স্বত্বের ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে জমিদারদের নির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিতে হত। আসলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল মূলত ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থে। কিন্তু ভাব দেখানো হয়েছিল- এই বন্দোবস্তের সূচনা করা হয়েছে কৃষকদের স্বার্থে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না-লর্ড কর্ণওয়ালিসের এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের ভূমি-ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে জমিদারদের অধিকার আরও দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। রায়তদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল করুণ। কারণ এই বন্দোবস্তের বলে রায়তদের ওপর প্রভুত্ব খাটাতে জমিদারদের কোনও অসুবিধে ছিল না। ইচ্ছেমত জমিদাররা রায়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন।

পূর্বে রায়তরা জমির ফসলের অংশ দিয়ে খাজনা দিতে পারতেন। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর ফলে কেবলমাত্র খাজনা-অর্থে প্রদান করতে হত জমিদারদের। এর ফলস্বরূপ কৃষকের ওপর অত্যাচার আরও বেড়ে গিয়েছিল।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন- 'কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত-পা বাঁধিয়া জমিদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন-জমিদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয়, সেইজন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না'।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের কৃষকদের কোনও আলোর নিশানা দেখাতে পারেনি।

রেগুলেশন ১৮১২ এবং ১৮১৮ প্রণয়ন করা হয়েছিল জমিদারদের সুবিধের জন্য। জমিদার প্রজাদের যে কোনও হারে পাট্টা দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। পাট্টার স্বত্ব অনুযায়ী অর্থ শোধ করতে না পারলে প্রজাদের নির্দিষ্ট জমি ছেড়ে দিতে হত।

এরপর জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ১৮৫৯ সালে রেন্ট অ্যাক্টটি পাশ করা হয়েছিল।

❖ **রেন্ট অ্যাক্ট ১৮৫৯:** এই আইনের মাধ্যমে প্রজাদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। প্রজাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল:

(১) নির্ধারিত খাজনায় এক শ্রেণীর প্রজা ভোগ দখল করার অধিকারী হবে।

(২) কোনও চাষী একই জমিতে ক্রমান্বয়ে ১২ বছর চাষবাস করলে সেই জমিতে খাজনা প্রদান সাপেক্ষে তার দখলী-স্বত্ব স্বীকৃত হবে।

(৩) রাজস্ব আদালত মারফৎ খাজনা স্থির বা বৃদ্ধি করা যাবে।

রেন্ট অ্যাক্ট দিয়েও জমিদারদের দমন করা যায়নি। সাধারণত জমিদাররা কৃষকদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ক্রমান্বয়ে ১২ বছর চাষ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই চাষীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিতেন।

এই আইনে বাস্তবে কৃষকদের বা প্রজাদের কোনও সুবিধে না হওয়ায় আনা হল **বেঙ্গল টেন্যান্সী অ্যাক্ট, ১৮৮৫।** এই আইনে বলা হয়েছিল কি শর্তে প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল-

(১) বায়ত যদি একই গ্রামের কোনও-না-কোনও জমি ১২ বছর পর্যন্ত চাষ করে, তাহলে সেই রায়ত দখলী স্বত্বের অধিকারী হবে।

(২) প্রজার খাজনা বৃদ্ধির নিয়মাবলী এই আইনে পরিবেশিত হয়েছিল।

(৩) বিক্রয় বা উইল দ্বারা দখলিকার রায়তকে প্রজাস্বত্ব হস্তান্তর অধিকার দেওয়া হয়।

(৪) এই প্রজা ভোগ দখলিকার অথবা রায়ত, তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশকে নিয়মাবলী এতে প্রসারিত হয়েছিল।

(৫) নির্দিষ্ট চুক্তি ভঙ্গ করা ব্যতীত কোনও দখলিকার রায়তকে উচ্ছেদ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যেত না।

(৬) আদালত কর্তৃক ন্যায্য খাজনা স্থির হলে, এও রায়তের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের জন্য তার কোনও পরিবর্তন না হবার কথাও বলা হয়েছিল।

জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে রায়তদের জীবন-জীবিকার কথা আরও ভালভাবে বলা হয়েছিল টেন্যান্সী অ্যাক্ট, ১৯২৮ এবং ১৯৩০-এর মাধ্যমে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বেঙ্গল টেন্যান্সী অ্যাক্ট, ১৮৮৫ ও তার পরবর্তী সংশোধনগুলিতে বর্নিত বিধান প্রকৃতপক্ষে প্রাক্ স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের জমিদার ও রায়ত সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

উনবিংশ শতকের শেষপ্রান্ত। এই সময় থেকে আওয়াজ উঠেছিল- 'লাঙ্গল যার জমি তার'। কিন্তু সেই আওয়াজে তীব্রতা না থাকায় কৃষকদের ভোগ করতে হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। মানতে হয়েছে বে-আইনি আদেশ। সাধারণত ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রশাসন জোতদার জমিদারদের কথামতই সমস্যার বিচার-বিবেচনা করতেন।

১৯৪৪ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেল কৃষির ওপর নির্ভরশীলদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ বর্গাচাষে নিযুক্ত। এই বর্গাচাষে নিযুক্ত বর্গাদাররা সম্মুখীন হতে থাকল নানা সমস্যার। বর্গাদারদের সমস্যা ভয়াবহ হয়ে উঠল। বর্গাদারদের অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য বেশ কয়েকবার একাধিক কমিশন বসানো হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত কাজ কিছু হয়নি। অশিক্ষিত কৃষক ও বর্গাদারদের ঠকানো হত ইচ্ছেমত।

তদানীন্তন সময়কার বর্গাদারদের প্রকৃত অবস্থা না জানলে ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বোঝা যাবে না। দিনের পর দিন বর্গাদাররা ভূস্বামী বা জমিদার শ্রেণীর কাছে নিষ্পেষিত হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে শুরু করেছিল।

স্বাধীনতা-পূর্বে কৃষিজীবী মানুষদের জীবনে নেমে এসেছিল অন্ধকার ভূস্বামীদের অন্যায় অত্যাচার। ভূস্বামীরা আর্থিক দিক থেকে ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন কৃষকের রক্তে।

স্বাধীন ভারতের ভূমি-সংস্কারের ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:-

- **স্বাধীনতার পর ভূমি-সংস্কারের চিন্তা-ভাবনা:** কেবলমাত্র ভূমির ওপর স্বত্ব এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট জমি জরিপ করলেই বাস্তবে খুব একটা লাভ হবে না। প্রয়োজন ভূমি-সংস্কারের-এই ভাবনা-চিন্তাটা চলছিল। তাই ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীণ আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

১৯৫৩ সালে জানা গিয়েছিল কৃষির আওতায় পশ্চিমবঙ্গের জমির পরিমাণ ছিল ১১,৭০,০০০ একর। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দখলে ছিল ৪,০০,০০০ একর। রায়ত এবং জোতদারদের দখলে ছিল ১০,৫০,০০০ একর। অধীনস্থ রায়তদের দখলে ছিল ৮,০০,০০০ একর। জোতদার জমিদাররা নিজেরা জমিতে চাষ করতেন না। চাষ-আবাদ করতেন ভূমিহীন কৃষক। স্বভাবতই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভূমি-সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই পর্বে সর্বপ্রথম জমি-সংস্কারের শুভ সূচনা হয়েছিল বর্গাদার অধিনিয়ম ১৯৫০-এর মাধ্যমে।

এই অধিনিয়মে বর্গাদার জোতদার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল সর্বপ্রথম। বর্গাদারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে গেলে কতকগুলি শর্ত আরোপ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হল ভাগচাষ বোর্ড স্থাপন করার। এই ভাগচাষ বোর্ডকে ক্ষমতা দেওয়া হল বর্গাদার ও জমির মালিকের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার।

এই বর্গাদার অধিনিয়মের মাধ্যমেও কিন্তু বর্গাদারদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। কারণ ভাগচাষ বোর্ডের রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেতে লাগল বর্গাদারদের বিরুদ্ধে। কাজেই বর্গাদাররা এই অধিনিয়মে বিশেষ উপকৃত হল না। এরপর এল ভূ-স্বত্ব অধিনিয়ম, ১৯৫৩ (**ওয়েস্টবেঙ্গল এস্টেটস অ্যাকুইজিসন অ্যাক্ট, ১৯৫৩)**।

এরপর অপর একটি আইন আনা হল। এই আইনের নামকরণ হল- **পশ্চিমবঙ্গ ভূ-স্বত্ব অধিগ্রহণ অধিনিয়ম, ১৯৫৩**। এই আইনটির মারফৎ ক্ষতিপূরণ দিয়ে রায়তের ওপর মধ্যসত্বভোগীদের অধিকার লোপ করা হয়। মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার রাজ্যের ওপর ন্যস্ত হয়। অবশ্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিজের খাস দখলে জন-প্রতি ২৫ একর পর্যন্ত জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই অধিনিয়মটির ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার রাজ্যে ন্যস্ত হওয়া ছাড়াও ভূ-নিম্নস্থ খনি ও খনিজ দ্রব্যের অধিকার এবং হাট-বাজার, বনসম্পদ প্রভৃতির অধিকার বর্তায় রাজ্য সরকারের ওপর।

এরপরে আসে **পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন, ১৯৫৫।**

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার আইন মূলত **১৯৫৫** সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন (West Bengal Land Reforms Act, 1955) এবং এর বিভিন্ন সংশোধনী ও বিধি দ্বারা গঠিত, যা ভূমি মালিকানা, ভূমি ব্যবহার এবং ভূমিহীনদের জন্য জমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

এখানে ভূমি সংস্কার আইন সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করা হলো:

আইনের উদ্দেশ্য:

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য জমির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, ভূমি মালিকানা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্য স্থাপন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা।

বর্গাদারদের অধিকার:

এই আইনে বর্গাদারদের জন্য জমির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে তারা তাদের চাষ করা জমি থেকে বিতাড়িত না হন এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

জমি বিতরণের নিয়ম:

ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য সরকারের কাছে থাকা জমি বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে, যা এই আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন দিক:

এই আইনের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন - ভূমি জরিপ, রেকর্ড আপডেটিং, ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রক:

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রকের মাধ্যমে এই আইনটি বাস্তবায়ন করে, যা ভূমি সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী।

অপারেশন বর্গা:

১৯৭৮ সালে চালু হওয়া অপারেশন বর্গা ভূমি সংস্কারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল, যা বর্গাদারদের অধিকার সুরক্ষায় সাহায্য করেছিল.

ভূমি সংস্কারের ইতিহাস:

১৯৫৩ সালের জমিদারী দখল আইন, ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন এবং ১৯৪৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ অ-কৃষিজমি রায়তি আইন ছিল ভূমি সংস্কারের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ.

সংশোধনী:

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ সালে বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয়েছে, যা ভূমি সংস্কারের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করেছে.

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইনের ৫৯ ধারাটিতে নিরসন (রিপীল) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

নিরসন (রিপীল): পশ্চিমবঙ্গ ভূ-সম্পত্তি অধিনিয়ম, ১৯৫৩-এর ধারা ২(৩)-এর বিধানাবলীর কোনও অনিষ্ট না করে নিম্নোক্ত প্রবিধানসমূহ এবং অধিনিয়মসহ, এতদ্বারা নিরসিত/রদ করা হয়েছিল, যথা-

(১) বঙ্গ পর্যাস্ত এবং শিবস্ত প্রবিধান, ১৮২৫ (দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যাণ্ড ডিলুভিয়ন অ্যাক্ট, ১৮২৫)।

(২) বঙ্গ পর্যাস্ত এবং শিবস্ত অধিনিয়ম, ১৮৪৭(দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন অ্যাক্ট, ১৮৪৭)।

(৩) বঙ্গ চর-ভূমি বন্দোবস্ত অধিনিয়ম, ১৮৫৮(দি বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন ল্যাণ্ড সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৫৮)।

(৪) বঙ্গ-খাজনা অধিনিয়ম, ১৮৫৯।

(৫) কুচবিহার জোত-স্বত্ব অধিনিয়ম, ১৯১০ (দি কুচবিহার টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯১০)।

(৬) পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার অধিনিয়ম, ১৯৫০ (দি ওয়েস্টবেঙ্গল বর্গাদারস্ অ্যাক্ট, ১৯৫০)।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন, ১৯৫৫ পাশ হওয়ার পর একাধিকবার আইনটিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে যেটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তার নাম দেওয়া হয়েছে-'অপারেশন বর্গা'।

❖ অপারেশন বর্গা:

শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানুষ কৃষির ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিল। এছাড়াও পরোক্ষভাবে বহু লোক কৃষির ওপর নির্ভর করে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

পুরানো বাংলা পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করলে অবিভক্ত বাংলার কৃষিজীবী মানুষের অবস্থা এবং তাঁদের জীবনযাত্রা জানা যাবে।

একসময় সংবাদ প্রভাকরে লেখা হয়েছিল-'বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপার্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর। এ কারণ, তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, সে অধিক সুদে কর্জ লইয়া মহাজনের নিকট নিয়ত বন্ধ রহিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য, ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণতুল্য কঠিন অন্তঃকরণও আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার মাসিক ব্যয় ৩ টাকার অধিক নহে, বার্ষিক আয় একশত টাকার অধিক নয়, একশত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পাঁচব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না'।

এসব দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের বেশিরভাগই অল্প জোতের কৃষক, ভূমিহীন, জনমজুর বা বর্গাদার। জমিদার, জোতদার এবং তাঁদের সেরেস্তার লোকজনরা বর্গাদারদের অবস্থা করে তুলেছিলেন অসহনীয়। বর্গাদার পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত জমিদার, জোতদার ও রাজা-উজিরের অনুকম্পার ওপর। জমিতে ফসল ফলাবার দায়িত্ব ছিল কৃষকের কিন্তু সেই ফসলের ওপর কৃষকের খুব কমই অধিকার ছিল।

স্বাধীনতার পর জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, ভূমি-সংস্কার আইন এবং কৃষি সংক্রান্ত একাধিক আইনের মাধ্যমে কৃষকদের জীবনধারার বেশ খানিকটা উন্নতি করা গিয়েছে। ভূমিহীন কৃষকদের জমি দেওয়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বর্গাদারদের অবস্থা হয়ত বর্তমানে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। জীবনযাত্রার মানও হয়ত কিছুটা বদলেছে। তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। সরকারী কর্তৃপক্ষ বা রাজনৈতিক দল কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য নানা ভাবনা-চিন্তা করছেন। তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন একাধিক আইন। সেই আইনগুলিতে কৃষকদের দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু অধিকার। সঙ্গে অবশ্য কিছু দায়িত্বও তাদের কাঁধে বর্তেছে। তবে সমৃদ্ধির পূর্ণ অবস্থায় যেতে তাদের অনেক পথ বাকি।

'অপারেশন বর্গা' বর্গাদারদের জীবনে এক নতুন আলো। বর্গাদারদের আন্দোলনের কথা উঠলে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় বর্গাদারদের তে-ভাগা আন্দোলনের কথা। বর্গাদারদের প্রাপ্য অর্ধাংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ বর্ধিত করার দাবী নিয়েছিল এই আন্দেলন।

তে-ভাগা আন্দোলনের বেশ কিছুকাল আগে সম্ভবত **১৯২৮** সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন করে বর্গাদারদের যখন প্রজা করে নেওয়া হল তখন বড় বড় জমির বা জোতের মালিকরা বর্গাদারদের প্রজা হওয়ার পথ বন্ধ করার নানারকম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু বর্গাদাররা ক্রমশই সক্রিয় হয়ে ওঠায় শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল এই তে-ভাগা আন্দোলন।

কৃষকদের আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে **১৯৫০** সালে বর্গাদার আইন পাশ করা হয়েছিল। আইনগত দিক থেকে বর্গাদারদের ন্যায্য অধিকার মেনে নেওয়া হলেও সেই আইনে নানা ফাঁক-ফোঁকর থাকায় বড় জমির মালিক সম্প্রদায় আইনের সেই ফাঁক-ফোঁকর কাজে লাগিয়ে বর্গাদারদের সবসময় তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছিলেন

কৃষকদের আন্দোলনও বন্ধ হয়নি। চলছিল কৃষক আন্দোলন, ক্ষেতমজুর আন্দেলন, বর্গাদারদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন। গ্রামে গ্রামে কৃষকের আওয়াজ উঠেছে তাদের দাবী-দাওয়ার স্বপক্ষে। কৃষকদের দাবীর সমবেত আওয়াজ ও কৃষক সংগঠনের চাপে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি-সংস্কার আইনের সূচনা।

আইনগতভাবে বর্গাদারদের স্বীকৃতি দেওয়া হলেও সঠিকভাবে আইনের বিধি-ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়নি নানা কারণে। কারণ যাইহোক-না-কেন সেই কারণগুলিকে দূরীভূত করতে না পারলে কেবলমাত্র নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করলে মূল সমস্যা মিটবে না।

আমাদের দেশে কৃষি সংক্রান্ত আইনের পরিকাঠামোকে পাল্টাতে না পারলে চাষ-আবাদে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত চাষী বা বর্গাদারদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। আইন-আদালত করে গরীব চাষী বা বর্গাদারদের পক্ষে জমির ধনী মালিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা খুবই কষ্টকর প্রয়াস। জমিদার তাঁর ইচ্ছেমত বর্গাদারকে উচ্ছেদ বা বর্গাচাষ বন্ধ করে দিয়ে চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে দ্বিধা করত না। আইনের বিধি-ব্যবস্থার জটিলতা গরীব ও অশিক্ষিত বর্গাদারদের পক্ষে বোঝা খুবই কঠিন ব্যাপার। সময় সময় বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে হয়ত বেশ কিছু সংখ্যক বর্গাদার এক জোট হয়েছে এবং তারা

তাদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরেছে, কিন্তু কার্যত তাদের দাবির অনেকাংশই পূরণ হয়নি। তবে বর্তমানে সরকারী সহযোগিতা বর্গাদারদের পক্ষে থাকায় বর্গাদাররা আগের মত বঞ্চিত হচ্ছে না।

অশিক্ষিত বর্গাদাররা যতদিন তাদের অধিকার ও আইনের বিধি-ব্যবস্থার কথা বুঝতে না পারবে ততদিন অন্যের সাহায্য নেওয়া ছাড়া তাদের কোনও উপায় নেই। বর্গাদাররা শিক্ষার আলোকে আলোকিত হলে নিজেরাই বুঝতে পারবে বর্গা-সম্বন্ধীয় আইন-কানুন এবং তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী। আইন ও নিয়ম অনুযায়ী তারা নিজেরাই পারবে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করতে। তখন তাদের কাছে অধিকার রক্ষার লড়াই, সামাজিক বৈষম্য এবং বঞ্চনার দিকটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে, যতবার সরকারী নির্দেশে বর্গাদাররা তাদের নাম নথিভূক্ত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছে (সরকারী খতিয়ানে নথিভুক্ত বা রেকর্ড করাতে উদ্যোগী হয়েছে) তখনই জমির মালিকরা নানাভাবে তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছিল জমির মালিকরা যেন বর্গাদারদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে না পারেন সেদিকে প্রথম দৃষ্টি রাখতে হবে সরকার ও কৃষিজীবীদের সংগঠনকে।

ভূমি-সংস্কার আইনকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে কৃষক ও বর্গাদারকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে জমির মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য। নতুবা ভূমি সংক্রান্ত কোনও আইনই বাস্তবায়িত হবে না। জমিচাষে চাষীর শস্য পাওয়ার অধিকার আইনগ্রাহ্য করাই বর্গাদারদের প্রথম সবল পদক্ষেপ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে- কৃষি সংক্রান্ত আইনে গলদের দিকটি ভূস্বামীরা বুঝতে পেরে বর্গা উচ্ছেদের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বর্গাদাররা ভীষণভাবে হয়রানি হচ্ছিল ভূস্বামীদের দ্বারা।

কৃষক এবং বর্গাদারদের আন্দোলন জোরদার হওয়ায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইনে নানা ত্রুটি দেখা দেওয়ায় ১৯৭০ এবং ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইনে একাধিক সংশোধন আনা হয়েছিল।

বর্গাদারদের জীবনে আলো আনার কথা ভেবে ১৯৭৭ সালে সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্গাদারদের দীর্ঘকালের লড়াইকে সম্মান জানিয়ে ক্ষেতে-খামারে বাস্তবতার সাথে ভূমি-সংস্কার আইনের বিধি-ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার (বর্গাদার) আইন স্বীকৃতি দিল বর্গাদারদের দাবী-দাওয়ার। বর্গাদাররা বুঝতে শিখল জমিতে তাদের স্বত্ব ও অধিকার।

'অপারেশন বর্গা'র ফলে বর্গাদারদের নাম সরকারী খাতায়-জেলায় জেলায়, মহকুমা-মহকুমায় নথিভুক্ত হতে লাগল। বর্গাদাররা হল রেকর্ডভুক্ত। একটা নতুন দিকের শুভ সূচনা হল।

বর্তমানে বর্গাদাররা সচেতন তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে। নির্দিষ্ট জমির সাথে সরকারী খতিয়ানে বর্গাদারদের নাম যুক্ত হলে বর্গাদাররা সুযোগ-সুবিধে পাবে নানাভাবে। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতেও তাদের অসুবিধে থাকবে না। এর ফলে চিরন্তন মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তির আলো দেখবে গরীব বর্গাদাররা। বর্গাদারদের অবস্থার উন্নতির সাথে গ্রামবাংলার চেহারাও পরিবর্তন হবে।

বর্গাদারদের প্রতি সরকারের সহানুভূতি এবং দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নানা কারণে পদে পদে বর্গাদারদের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। হাজার হাজার মামলা-মোকদ্দমা বর্গাদারদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে ঝুলছে। মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়ায় আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

বর্গাদারদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা জমে থাকায় বর্গাদাররা তাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং আইনগত অধিকার বাস্তবে কাজে লাগাতে পারছে না।

অপারেশন বর্গা কিন্তু নতুন কোনও আইন নয়। তৎকালীন আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে যারা প্রকৃতই বর্গায় চাষ করছে, সরকারী নথিতে তাদের নাম দ্রুত লিপিবদ্ধ করাই অপারেশন বর্গার আসল উদ্দেশ্য।

অপারেশন বর্গা আসলে কি? অপারেশন বর্গা হল- বর্গায় চাষ করা চাষীদের (বর্গাদারদের) আইনত বর্গাদার করার অভিযানই 'অপারেশন বর্গা'।

জমি সংক্রান্ত বিষয়টি খুব স্পর্শকাতর। বাংলার সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের ভাষায় জমির ওপর তাদের স্বত্ব কতটা তা বুঝে নেওয়ার জন্য উন্মুখ। জমির অংশ ও জমির পরিধি বা পরিমাপ নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য জমির সঠিক জরিপ খুবই প্রয়োজনীয়। ভূমি-স্বত্ব বা জমি জরিপ নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হলে স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে এসে যায় ভূমি-সংস্কার আইন, নির্দিষ্ট জমি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সরকারীভাবে নথিভুক্ত করা, জমির মিউটেশন যথাসময়ে পদ্ধতি মেনে করা, জমির রূপান্তর, বর্গাদারি বিষয়ে আইনের বিধান, বর্গাদার উচ্ছেদ, সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ ও অপ্রয়োজনে সেই জমি অথবা আংশিক জমি ছেড়ে দেওয়া, জমির বিভক্তিকরণ, সরকারী জমি লিজ দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি নিরূপণ করতে হয় সঠিকভাবে জমি জরিপ করে, সঠিকভাবে জমি জরিপের ব্যাপারটি বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ জানেন না। জমি জরিপের কার্যটি সাধারণত করে থাকেন আমিনরা।

জমি নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি হলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কোনও পক্ষ দেওয়ানি আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করেন। অনেক সময়ই আদালতের নির্দেশে সার্ভে পাশ করা উকিলবাবুদের জমি জরিপ করে নির্দিষ্ট জমির জন্য রিপোর্ট দিতে বলে নির্দিষ্ট জমির ম্যাপসহ। সরকারী স্তরে জমি জরিপের দায়িত্বও অর্পিত হয় আমিনদের ওপর।

স্বভাবতই বোঝা যায়-জমির পরিমাণ বা চৌহদ্দি নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে জমি জরিপের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

রায়তের সংজ্ঞা কি?

যেকোন কার্যে জমিকে ব্যবহারের জন্য মালিকানা স্বত্বে যে ব্যক্তি জমি ভোগ দখল করেন।

রায়ত বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সরাসরি সরকারের অধীনে জমি চাষ করার অধিকার অর্জন করেছেন। যে-কোন বিদ্যালয়, সংগঠন, হাসপাতাল, সেবা-প্রতিষ্ঠান, এন. জি. ও, ভলান্টারি অর্গানাইজেশন প্রভৃতিও রায়ত হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে জেনে রাখতে হবে রায়ত কিন্তু কোনও অবস্থাতেই জেলা সমাহর্তার অনুমতি ছাড়া তাঁর জমির চরিত্র বা শ্রেণী ও ব্যবহারগত কোনও পরিবর্তন করতে

পারেন না। রায়ত ইচ্ছে করলেই উপযুক্ত কারণ ছাড়া তাঁর হেফাজতে থাকা চাষের যোগ্য জমি ফাঁকা ফেলে রাখতে পারেন না।

জমি রেকর্ডের পদ্ধতি কিভাবে নেওয়া হয়েছিলঃ-

সরকারী অফিসে দেশের, গ্রামের নির্দিষ্ট এলাকার মোট জমির পরিমাণ ও ম্যাপ (মানচিত্র) পাওয়া যাবে। দেশে মোট জমির পরিমাণ মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট বলা যায়। সার্চিং করলে জমির মালিকানা অতীতে কার ছিল তা জানা যায়। অর্থাৎ জমির হাতবদল হওয়ার চিত্রটি জানা যায়। ভূমি ও ভূমি-সংস্কার আইনে রেকর্ড অফ রাইটসের তৈরির পদ্ধতির কথা বলা আছে।

এই পদ্ধতি হল: (১) ট্রাভার্স সার্ভে (২) ক্যাডাসট্রাল সার্ভে (৩) খানাপুরী (৪) বুঝারত (৫) তসদিক (৬) খসড়া আর. ও. আর. প্রস্তুতি (৭) অভিযোগ সংক্রান্ত নিষ্পত্তি (৮) ফাইন্যাল রেকর্ড প্রস্তুতি ও তার প্রকাশনা।

সাধারণ লোকের জন্য ট্রাভার্স সার্ভে ও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে প্রয়োজন না হলেও সরকারী ক্ষেত্রে এই দু-রকম সার্ভেরই প্রয়োজন হয়।

এছাড়া যে-কোনভাবেই যে কোন ব্যক্তি জমির মালিক হোন-না-কেন এবং সেই জমিতে যদি সেই ব্যক্তির দখল থাকে তবে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে নিজ হকদারের জমিটি ব্লক ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস অফিসে গিয়ে বিহিত ব্যবস্থা অনুযায়ী তা রেকর্ড করিয়ে নেওয়া। ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড অফিসারকেই সংক্ষিপ্তভাবে বি. এল. & এল. আর. ও. বলা হয়। এই বি. এল. আর. ও. অফিসে খোঁজ খবর করলে ঐ ব্লকে অবস্থিত জমির দাগ নম্বর (প্লট নম্বর) খতিয়ান, জমির পরিমাণ (শতক/একর হিসেবে সব কিছুই পাওয়া যাবে। এলাকার জমির নকশাও রয়েছে। একটি মৌজায় কোন ব্যক্তির একের বেশিও খতিয়ান পাওয়া যেতে পারে।

সরকারী রেকর্ড অফ রাইটসে জমির পরিমাণ যা দেখানো আছে তা খতিয়ানেই হোক কিংবা দাগ নম্বরেই হোক-সেই জমির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জরিপ করানো প্রয়োজন। জমি ক্রয় করার পর জমির পরিমাণ ও সীমারেখা নিয়ে যাতে ভবিষ্যতে বিবাদ বিসংবাদ না হয় সেজন্য জরীপ করে জমি ক্রয় করা উচিত।

এই রেকর্ড অফ রাইটসকে সরকারী দলিল হিসেবে গণ্য করতে হবে। রেকর্ড অফ রাইটসকে সংক্ষেপে ROR বলা হয়। ROR এর সার্টিফায়েড কপি কে পর্চা বলা হয়। এই পরচা কেই বাংলায় বলা যেতে পারে স্বত্বলিপি।

জমি জরিপ ও খতিয়ান প্রস্তুতি ও সংশোধন জানতে হলে ট্রাভার্স সার্ভে, ক্যাডাস্ট্রারাল সার্ভে, খানাপুরি, বুঝারত, তসদিক বিষয় ভালভাবে বুঝতে হবে।

(১) ট্রাভার্স সার্ভে :-

৫১ ধারার উপধারা (১) অনুসারে কোনও জেলার বা তদীয় অংশের খতিয়ান সংশোধন বা প্রস্তুতের জন্য ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ট্রাভার্স সার্ভের ভিত্তিতে হবে। এই ট্রাভার্স সার্ভে থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থিওডোলাইট যন্ত্রের সাহায্যে একটি মৌজা ও গ্রামের (যদিও একটি মৌজায় একাধিক গ্রাম থাকতে পারে) বহিঃসীমায় বেশ কয়েকটি স্থির বিন্দু সঠিকভাবে নির্দেশ করে মৌজার বা গ্রামের সীমারেখাটি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকেই সাধারণভাবে ট্রাভার্স সার্ভে বলে।

(২) ক্যাডাসট্রাল সার্ভে:-

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইনের ৫১ (১) ধারা অনুসারে কার্যাবলীসমূহ চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পূর্বে কৃত ভূমি-রাজস্ব জরিপে প্রতিটি গ্রামে যেরূপ অবলম্বিত হয়েছিল, সেরূপ প্রতিটি গ্রামের অথবা যে কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সরকার কর্তৃক কৃত জরিপে সরকারী গেজেটে অধিসূচনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট গ্রামের বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র প্রস্তুত করতে হয়। এই মানচিত্রে রাস্তা, নদী, রেললাইন এবং উক্ত অঞ্চলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, তৎসহ বাস্তুভিটা ও দাগসমূহ দেখাতে হবে। ক্যাডাস্ট্রাল শব্দটি এসেছে ফরাসী শব্দ থেকে। শব্দটির বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, জমির প্রতিটি প্লট বা দাগে গিয়ে সেই স্থানের জমির চরিত্র ও পরিমাণ নিরূপণ করা এবং সেই নির্দিষ্ট জমিতে কে কি ধরনের স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার ভোগ করেন এবং কি ধরনের ভোগ দখলের ধরণটি কিরকম তার পূর্ণ বিবরণ যে সার্ভের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হবে।

হয়ত বেশ কিছু গ্রামের মানচিত্র আগেই জরিপ করে তৈরি হয়ে থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে পূর্বের সেই জরিপকৃত গ্রামের মানচিত্রের সীমানাযুক্ত আয়তন পরিকল্পিত ও জরিপের একক হিসেবে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে প্রশাসনিক আধিকারিক সংশ্লিষ্ট রায়তদের বক্তব্য শুনে যথাবিহিত পদ্ধতি অনুসরণ করে যুক্তিসহকারে তাঁর রিপোর্ট রাজস্ব পর্ষদের নিকট দাখিল করবেন। আধিকারিকের রিপোর্ট রাজস্ব পর্ষদ অনুমোদন করলে, খতিয়ান সংশোধন ও মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য একক হিসেবে সেইক্ষেত্রে গৃহীত হবে। এর পরে রাজস্ব পর্যদের নতুন আদেশের নকল গেজেটে প্রকাশ করার জন্য (গেজেট নোটিফিকেশন) সরকারের নিকট পাঠিয়ে দিতে হবে।

(৩) খানাপুরী:-

এই স্তরে খতিয়ান সংশোধন বা প্রাথমিক খতিয়ানের প্রস্তুতের কাজ শুরু হবে। খসড়া নথিতে স্বত্বের বিবৃতি থাকবে এবং অতঃপর এগুলি খতিয়ান রূপে বর্ণিত হবে। জমিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির বা যুক্তভাবে একটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের ব্যক্তিগণের জন্য পৃথক খতিয়ান হবে। এই সময় খসড়া খতিয়ানে উক্ত বিবরণ-সমূহ লিপিবদ্ধ হবে এবং পরবর্তী দুই স্তরে খসড়া এবং প্রত্যেক খতিয়ানে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে প্রত্যেক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বত্ব ও দায়িত্ব প্রদর্শিত হবে। এই স্তরে গ্রামের দাগের ধারাবাহিক নম্বর অনুসারে ফিল্ড ইনডেক্স বা খসড়া প্রস্তুত করতে হবে। এই ফিল্ড ইনডেক্স অবশ্য খসড়া খতিয়ানের অংশ হবে না।

(৪) বুঝারত:-

এই স্তরের প্রারম্ভে নতুন খতিয়ানের প্রতিটি দাগের আয়তন বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তারপর এরূপ প্রাথমিক খতিয়ানের নকল প্রত্যেক রায়ত এবং যাঁদের নাম খতিয়ানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁদের সকলকে অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক খতিয়ানের নকলকে 'পরচা' বলা হয়। 'পরচা' বিতরণের পর রাজস্ব আধিকারিক অথবা এতদুপলক্ষে তাঁর দ্বারা অনুমোদিত কোন ব্যক্তি প্রতিটি দাগে উপস্থিত হয়ে, যাঁর বা যাঁদের নামে দাগটি লিপিবদ্ধ হয়েছে, গ্রামের মানচিত্র উল্লেখ করে তাঁকে বা তাঁদের অনুমোদিত প্রতিনিধিকে (যদি তিনি উপস্থিত থাকেন) বুঝিয়ে দেবেন। এই সময় রাজস্ব আধিকারিক বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে মানচিত্র, খতিয়ান ইত্যাদি সংশোধন করবেন এবং 'পরচা' দাখিল হলে তাও সংশোধন

করে দেবেন। এই স্তরের রায়তের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁর দ্বারা প্রদেয় রাজস্ব ও উপকর লিখতে হবে। বিধিগত অন্যান্য বিষয় তসদিক স্তরে সম্পন্ন হবে।

বুঝারৎ শব্দটির অর্থ পরিষ্কারভাবে বুঝতে গেলে 'কে. বি' শব্দটির মানে জানতে হবে। 'কে. বি.' হল 'খানাপুরী বুঝারৎ'। 'খানা'-কে বলা হয় দাগ বা নির্দিষ্ট কোনও প্লট। পুরী শব্দটির অর্থ হল 'পূরণ করা'। নির্দিষ্ট দাগ বা প্লট সম্পর্কে সবরকম স্বত্বের তথ্য সংগ্রহ করা।

'তসদিক' সহ উপরিউক্ত স্তরগুলি রাজ্য সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে বাতিল বা যুক্ত করে খতিয়ান প্রস্তুত করা যেতে পারে।

রাজস্ব আধিকারিক খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত খতিয়ান সংশোধন বা প্রস্তুতকরণের যে কোনও কার্যাবলী বাতিল করে নতুনভাবে সংশোধন বা প্রস্তুতের আদেশ দিতে পারেন।

(৫) তসদিক:-

গ্রামের নিকট সুবিধাজনক স্থানে তসদিকের কাজ শুরু করতে হবে। যেক্ষেত্রে বুঝারৎ পর্যন্ত সকল স্তর বাতিল করে তসদিক স্তর হতে খতিয়ান প্রস্তুত করতে হবে, সেক্ষেত্রে তসদিকের পূর্বে রাজস্ব আধিকারিক প্রয়োজনানুযায়ী প্রতিটি দাগের বর্তমান অবস্থা তদন্ত করে পূর্বের মানচিত্র ও খতিয়ান সংশোধন করবেন। তসদিকের পূর্বে নোটিশ জারী করে সকল রায়ত ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের স্বত্ব ও দখল প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তসদিকের সময় উপস্থিত থাকার আহ্বান জানাবেন। জোতের যে সকল পরিবর্তন পূর্বের খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হবার পর নিম্নোক্ত কারণবশত হয়েছে, তা রাজস্ব আধিকারিকের দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তসদিকের সময় উপস্থিতির জন্য নির্দিষ্টভাবে নোটিশে উল্লেখ রাখতে হবে-

(ক) উত্তরাধিকার বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ও প্রাপ্য, হস্তান্তর বা অন্য কোনও কারণ,

(খ) জোত একত্রকরণ বা বিভাজন,

(গ) নতুন বন্দোবস্ত,

(ঘ) অন্য যে কোনও কারণসমূহ:

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তির খতিয়ান রাজস্ব আধিকারিক পরীক্ষা করে প্রতিটি লিখিত বিষয়ে তাঁকে পাঠ করে জানাবেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী খতিয়ান সংশোধন করে খতিয়ানে সকল লিপিবদ্ধের কাজ সমাপ্ত করবেন। জমির মালিকানা বা জমির কোনও স্বত্বের মালিকানা নিয়ে বিরোধ রাজস্ব আধিকারিক সরাসরি পদ্ধতিতে বর্তমান জমির দখলানুযায়ী নিষ্পত্তি করবেন। রায়তের বা রায়তদের একটি দলের স্বত্বে কোনও শর্ত বা তার অনুসঙ্গ কিছু থাকলে তা এবং রাজ্য সরকারকে আইনত প্রদেয় রাজস্ব, খতিয়ানে রাজস্ব আধিকারিক স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করবেন। যে ক্ষেত্রে পূর্বে প্রস্তুত এবং তৎসময় প্রচলিত কোনও আইন অনুসারে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান সংশোধনের কার্যনির্বাহ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যদি কোনও খতিয়ানে লিখিত বিষয়বস্তু বর্তমান প্রকৃত দখলানুযায়ী ঠিক থাকে, তাহলে নতুন কোনও কিছু লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তসদিককৃত প্রতিটি খতিয়ানে রাজ্য সরকারকে প্রদেয় উপকর লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তৎপর রাজস্ব আধিকারিক মূল খতিয়ানে তারিখসহ স্বাক্ষর করবেন। গ্রামের সকল খতিয়ান তসদিকের পর যথাবিহিত কার্যাবলী রাজস্ব আধিকারিককে করতে হবে।

(৬) খসড়া আর. ও. আর. প্রস্তুতি

(৭) অভিযোগ সংক্রান্ত নিষ্পত্তি

(৮) ফাইন্যাল রেকর্ড প্রস্তুতি ও তার প্রকাশনা।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১ (West Bengal Land and Land Reforms Manual, 1991) হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত একটি নির্দেশিকা। এই ম্যানুয়ালটি মূলত ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই ম্যানুয়ালটিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, বিধি এবং সরকারি নীতির বিশদ বিবরণ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১ এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল:

- ভূমির অধিকার এবং রেকর্ড তৈরি এবং সংশোধন করার পদ্ধতি
- জমির মালিকানা হস্তান্তর এবং উত্তরাধিকারের নিয়মাবলী
- বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব
- ভূমি সিলিং এবং উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
- সরকারি জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত
- ভূমি রাজস্ব এবং অন্যান্য সরকারি পাওনা আদায়
- ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা, যা রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে।

---

১. ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসনিক কাঠামো

1. **জেলা পর্যায়ে:**
    - জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (D.L.L.R.O.) প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত।
    - জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ তত্ত্বাবধানে কাজ করেন।
2. **উপ-বিভাগীয় পর্যায়ে:**
    - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (S.D.L.L.R.O.) কাজ পরিচালনা করেন।
    - সংশ্লিষ্ট ব্লকের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করেন।
3. **ব্লক পর্যায়ে:**
    - ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (B.L.L.R.O.) মূল দায়িত্ব পালন করেন।
    - জরিপ ও বন্দোবস্ত, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের কাজ পরিচালিত হয়।
4. **গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে:**
    - রাজস্ব পরিদর্শক (R.I.) এবং ভূমি সহায়ক (B.S.) ভূমি সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ পরিচালনা করেন।

---

২. ভূমি রেকর্ড এবং রেকর্ড-অফ-রাইটস (RoR) সংশোধন

- **রেকর্ড-অফ-রাইটস (RoR) হালনাগাদ:**
    - পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুসারে ভূমি মালিকানার নথি প্রস্তুত ও সংশোধন করা হয়।
    - রাজস্ব পরিদর্শক ও ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের মাধ্যমে জরিপ ও নথিভুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়।

- **রেকর্ড সংশোধনের পর্যায়:**
    - মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও তথ্য সংগ্রহ।
    - খসড়া প্রকাশ ও আপত্তি গ্রহণ।
    - আপত্তি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত রেকর্ড প্রকাশ।
    - সংশোধিত রেকর্ড রাজস্ব পরিদর্শকের অফিসে সংরক্ষণ।

---

৩. নামজারি (Mutation) প্রক্রিয়া

- নামজারি বলতে বোঝায়, মালিকানার হস্তান্তরজনিত কারণে ভূমি রেকর্ডে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা।
- **কারণভিত্তিক নামজারি:**
    1. **বিক্রয় বা হেবা/দানপত্র দলিলের মাধ্যমে**
    2. **উত্তরাধিকার সূত্রে**
    3. **জমির বিনিময় (Exchange)**
- **নামজারি আবেদন প্রক্রিয়া:**
    1. সংশ্লিষ্ট ব্লক বা রাজস্ব পরিদর্শকের অফিসে আবেদন জমা দিতে হয়।
    2. আবেদন যাচাই ও জমির দখল সম্পর্কে তদন্ত করা হয়।
    3. অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংশোধন করা হয়।

---

৪. বর্গাদার রেকর্ডকরণ ও অধিকার

- **বর্গাদার সংজ্ঞা:**
  - ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী, যে ব্যক্তি অপরের জমিতে ভাগ চাষ করে, তিনি বর্গাদার।
  - পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কৃষিকাজ করে, তাহলে তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্গাদার হিসেবে ধরা হয়।
  - বর্গাদাররা হলেন সেই ব্যক্তি যারা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন এবং ফসলের একটি অংশ জমির মালিককে দেন।
- **বর্গাদার রেকর্ড করার পদ্ধতি:**
  - ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বা রাজস্ব পরিদর্শকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
  - মাঠ পর্যায়ে তদন্ত ও শুনানির পর রেকর্ড সংশোধন।
  - সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের আপত্তি থাকলে, তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা।
- **বর্গাদারদের অধিকার** (Rights of Bargadars)
  - **জমির নিরাপত্তা:** বর্গাদারদের জমির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। জমির মালিক বর্গাদারদের বিনা কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারেন না।
  - **ন্যায্য ভাগ:** বর্গাদাররা উৎপাদিত ফসলের একটি ন্যায্য ভাগ পাওয়ার অধিকারী। এই ভাগ সাধারণত মোট উৎপাদনের ৫০% হয়ে থাকে, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি ৭৫% পর্যন্ত হতে পারে।
  - **রসিদ পাওয়ার অধিকার:** বর্গাদাররা জমির মালিকের কাছ থেকে তাদের ভাগের রসিদ পাওয়ার অধিকারী।
  - **ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার:** যদি জমির মালিক বর্গাদারদের বিনা কারণে জমি থেকে উচ্ছেদ করেন, তবে বর্গাদাররা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

- **সরকারি সুবিধা পাওয়ার অধিকার:** বর্গাদাররা সরকারি বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, যেমন কৃষি ঋণ, বীজ এবং সারের ভর্তুকি ইত্যাদি।

- **বর্গাদারদের দায়িত্ব (Responsibilities of Bargadars)**
  - **সঠিকভাবে চাষাবাদ করা:** বর্গাদারদের জমি সঠিকভাবে চাষাবাদ করতে হবে এবং ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।
  - **জমির মালিককে ন্যায্য ভাগ দেওয়া:** বর্গাদারদের জমির মালিককে তাদের ন্যায্য ভাগ সময়মতো দিতে হবে।
  - **জমির ক্ষতি না করা:** বর্গাদারদের জমির কোনো ক্ষতি করা উচিত নয়।
  - **সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলা:** বর্গাদারদের সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ দ্বারা সুরক্ষিত।

- বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি, যাতে তারা তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারেন এবং তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

- যদি কোনো বর্গাদার তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তবে তারা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারেন।

বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কিত কিছু অতিরিক্ত তথ্য

- পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫-এ বর্গাদারদের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
- এই আইনে বর্গাদারদের জমির নিরাপত্তা, ন্যায্য ভাগ, রসিদ পাওয়ার অধিকার, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার এবং সরকারি সুবিধা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।
- এই আইনে বর্গাদারদের সঠিকভাবে চাষাবাদ করা, জমির মালিককে ন্যায্য ভাগ দেওয়া, জমির ক্ষতি না করা এবং সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

- **বর্গাদারদের সুরক্ষা:**
    - পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী, কোনো বর্গাদারকে তার জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না, যদি না তিনি স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে দেন।
    - জমির উৎপাদিত ফসলের ভাগ নির্ধারণ করা হয় চুক্তি বা সরকারি নির্দেশনার মাধ্যমে।
    - সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে, বর্গাদারদের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম ভাগ রাখা হয়।
    - বর্গাদারদের জমি চাষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, আদালতের অনুমতি ছাড়া জমির মালিক একতরফা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।
    - বর্গাদারদের অভিযোগের ক্ষেত্রে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

---

৫. জমির শ্রেণীবিন্যাস ও রূপান্তর (Conversion)

- **জমির শ্রেণীবিন্যাস:**
    - কৃষিজমি
    - বসতভিটা
    - শিল্প বা বাণিজ্যিক জমি
- **জমির শ্রেণী পরিবর্তনের শর্ত:**
    - কৃষিজমিকে শিল্প বা আবাসিক কাজে রূপান্তর করতে অনুমোদন আবশ্যক।
    - সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসে আবেদন জমা দিতে হয়।
    - প্রশাসনিক অনুমোদনের পর জমির শ্রেণী পরিবর্তন কার্যকর হয়।

---

৬. ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

- ভূমি রাজস্ব, খাজনা ও বিভিন্ন সরকারী ফি ব্লক অফিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।
- নামজারি, জমি বন্দোবস্ত ও জরিপ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট আইন ও বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয়।